সিরাজ সিকদার রচনা

জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে কৃষকের ওপর নির্ভর করুন!

পাক সামরিক দস্যুদের শীতকালীন অভিযান এবং ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ মুক্তি বাহিনীর ফ্যাসিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের জনগণ-বিরোধী তৎপরতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করুন!

গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিন!

সিরাজ সিকদার

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি কর্তৃক রচনা ও প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭১

কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বহারা পথ (www.sarbaharapath.com) এর অনলাইন প্রকাশনা ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের শীতকালীন অভিযান শুরু করে দিয়েছে। পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এ অভিযান তীব্রতর ও নির্মম হয়ে উঠবে। ১৯৭২ সালের জুন-জুলাই পর্যন্ত এ অভিযান চলবে।

পাক-সামরিক ফ্যাসিষ্টদের এ শীতকালীন অভিযানের লক্ষ্য হলো পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বাধীন জাতীয় মুক্তি বাহিনীর গেরিলা এবং আওয়ামী লীগ ফ্যাসিষ্ট মুক্তি বাহিনীকে গ্রাম থেকে উৎখাত করা, গ্রামসমূহকে পরিষ্কার করা, ডিসেম্বরের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত করা, উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা।

পাক সামরিক ফ্যাসিষ্টদের শীতকালীন অভিযানে যুক্ত হয়েছে ছয় পাহাড়ের দালাল আওয়ামী লীগ ফ্যাসিষ্ট মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সমস্যা। এরা পুর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি ও তার নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তিবাহিনীকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

কাজেই একদিকে পাক সামরিক ফ্যাসিষ্টদের শীতকালীন অভিযান, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের টিকে থাকা ও বিকাশ লাভ করার সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

১

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তিবাহিনী এবং আওয়ামী লীগ ফ্যাসিষ্ট মুক্তিবাহিনীকে গ্রামাঞ্চলে ধ্বংস করার জন্য পাক সামরিক ফ্যাসিষ্টরা ঘেরাও-দমন অথবা “খোঁজ কর, ধ্বংস কর” অভিযান পরিচালনা করবে।

প্রথমটিকে তারা প্রয়োগ করে ঐ সকল এলাকায় যেখানে মুক্তি বাহিনীর তৎপরতার কেন্দ্র রয়েছে বলে তারা মনে করে। যেমন ১নং ফ্রন্ট এরিয়া। [বরিশালের পেয়ারাবাগান এলাকাটি ছিল ১নং ফ্রন্ট এরিয়া—সর্বহারা পথ] প্রথমে সমগ্র অঞ্চলকে তারা ঘেরাও করে, এ অঞ্চল থেকে বেরুবার পথসমুহের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে প্রধান ক্যাম্প স্থাপন করে, কারফিউ জারী করে, প্রতি ক্যাম্পের মধ্যকার অঞ্চলে চব্বিশ ঘন্টা পাহাড়ার ব্যবস্থা করে। এ সকল প্রধান ক্যাম্পের সাথে নিকটবর্তী বড় সামরিক ঘাঁটির সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে।

এরপর তারা ঘেরাওকৃত অঞ্চলের মাঝে কয়েকটি উপক্যাম্প স্থাপন করে। ক্যাম্পগুলো সাধারণতঃ তারা স্কুলবিল্ডিং বা পাকা বাড়ীতে স্থাপন করে। এ সকল ক্যাম্প থেকে তারা ঘেরাও-এর মধ্যকার ও আশে-পাশের প্রতিটি গ্রামে “খোঁজ কর, ধ্বংস কর” অভিযান পরিচালনা করে এবং সবকিছু লুট করে, পুড়িয়ে দেয় এবং সবাইকে হত্যা করে।

অনেক ক্ষেত্রে তারা বন্দুক দেখিয়ে এবং জাতীয় শত্রুদের সহায়তায় আশে-পাশের অঞ্চল থেকে হাজার হাজার জনসাধারণকে গেরিলাদের খোঁজ করা, লুট, অগ্নি-সংযোগ, হত্যার কাজে লাগায়। অনেক সময় তারা ধর্মের পার্থক্য বা ভাষা, জাতীয়তার পার্থক্যকে কাজে লাগায় এবং জনগণের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

গেরিলারা ধ্বংস হয়েছে বা নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত বা নিজেদের পরাজয় বরণ পর্যন্ত এ অভিযান তারা অব্যাহত রাখে। এর পর তারা ঘেরাও উঠিয়ে চলে যায়।

"খোঁজ কর, ধ্বংস কর" অভিযান সাধারণতঃ দিনে শুরু হয়, গ্রামের পর গ্রাম ধবংস করা হয়, কয়েকদিক থেকে ধ্বংসকারী বাহিনী এক স্থানে মিলিত হয়, সারাদিন ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে দস্যু বাহিনী দিন থাকতেই শহরের ঘাঁটিতে ফিরে যায়।

ঘেরাও-দমন বা "খোঁজ কর, খতম কর" অভিযানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাক-সামরিক দস্যূদের ইউনিটসমূহ ঝোপঝাড়, মাঠ-ঘাট লক্ষ্য করে, এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করতে করতে অগ্রসর হয়। এর কারণ তারা অজানা-অচেনা গ্রামের প্রতিটি ঝোপ-ঝাড়, মাঠ-ঘাট, বাড়ী-ঘরকে শত্রু বলে ভয় করে, যে কোন স্থান থেকে অতর্কিতে হামলার সম্ভাবনায় তটস্থ থাকে। এর ফলে তাদের অবস্থান সহজেই জানা যায়।

শহরে পালিয়ে আসা জাতীয় শত্রু, আশে-পাশের জাতীয় শত্রু ও তাদের গ্রামস্থ গোপন ও প্রকাশ্য চররা সামরিক ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের সাথে আসে, পথ দেখিয়ে দেয়; লুট, হত্যা, অগ্নিসংযোগ করে; খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে, খবর সরবরাহ করে, গেরিলাদের খোঁজ করে, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ধরিয়ে দেয়।

২

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলরা যথাযথ খবরের ভিত্তিতে আমাদের কোন কোন ইউনিটকে ঘেরাও করে, নিরস্ত্র করে কিছুসংখ্যক কর্মীকে হত্যা করে। টাঙ্গাইলে জাতীয় শত্রু চেয়ারম্যানের খবরের ভিত্তিতে তারা আমাদের দু' জন গেরিলাকে কেটে কেটে লবন দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বহু স্থানে তারা আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে।

আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল এরূপ কিছু বুদ্ধিজীবী, ভ্রষ্ট সর্বহারাদের আমরা সরল বিশ্বাসে আমাদের গেরিলা বাহিনীতে নিয়েছিলাম, পাক-সামরিক ফ্যাসিষ্টদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। কিন্তু ভারত-প্রত্যাগত মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে যোগাযোগ হলে তারা প্ররোচিত হয়ে দলত্যাগ করে এবং বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করে আমাদের কর্মীদের ও ইউনিটের অবস্থান জানিয়ে দেয়, তাদের সাথে যোগদান করে। অনেকক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল কিন্তু আমাদের আশ্রয়ে বেঁচেছিল এরূপ কিছু সংখ্যক সামন্তবাদী, বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী সহানুভূতিশীলরা ভারত-প্রত্যাগত মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের খবর সরবরাহকারী হয়।

কয়েক ক্ষেত্রে ঐক্যের আলোচনার কথা বলে তারা ঐক্য-বৈঠকে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের কর্মীদের গ্রেফতার ও নিরস্ত্র করে; মৃত্যুদণ্ড দেয়। একক্ষেত্রে জনসাধারণ হস্তক্ষেপ করে; তারা বুক পেতে বলে আমাদের আগে হত্যা কর, তারপর একে হত্যা কর; জনসাধারণের হস্তক্ষেপে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আমাদের কর্মীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কয়েকক্ষেত্রে গ্রেপ্তারকৃত আমাদের কর্মীরা পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

৩

আমাদের গেরিলা বাহিনী শুন্য থেকে গড়ে উঠেছে, তাদের সংখ্যা কম, বন্দুক এবং পুরোনো রাইফেল দ্বারা সজ্জিত; অস্ত্রের স্বল্পতার জন্য সকল গেরিলা সশস্ত্র নয়; পাক-সামরিক ফ্যাসিষ্টদের সাথে লড়াইয়ে তারা অভ্যস্ত নয়। এগুলো হচ্ছে তাদের দূর্বলতা। পক্ষান্তরে তাদের শক্তিশালী দিক হলো, তাদের শৃংখলা উন্নত, তারা নিজেদের দেশে ন্যায় যুদ্ধ করছে, জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে পোড় খাওয়া; রাত্রি-অভিযানে অভ্যস্ত, বিভিন্ন ইউনিট ও উচ্চস্তরের সাথে দৃঢ় সংযোগ রয়েছে, গেরিলাদের পরিচালনাকারী একটি সঠিক রাজনৈতিক পার্টি রয়েছে, রাজনৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে তারা আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ, জনসাধারণের সাথে তারা অনেকখানি যুক্ত।

পাক সামরিক দস্যুদের শক্তিশালী দিক হলো তাদের হাতে রয়েছে রাষ্ট্র ক্ষমতা, আধুনিক অস্ত্র, সামন্তবাদী ধর্মীয় মনোবল, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কষ্টসহিষ্ণুতা। কিন্তু তাদের দুর্বল দিক হলো তারা বিদেশে অন্যায় বর্বর যুদ্ধ করছে, তাদের জন-সমর্থন নেই। তাদের সংখ্যাস্বল্পতা, অজানা-অচেনা গ্রামে তারা লড়াই করছে।

আওয়ামী লীগের মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিষ্টদের সবল দিক হলো তাদের আধুনিক অস্ত্র রয়েছে, লোকবল রয়েছে, ভারত তাদেরকে সহায়তা ও সমর্থন করছে, ভারতের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ তাদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করছে, তাদের কিছুটা গণ-সমর্থনও আছে। তাদের দুর্বল দিক হলো তারা জনগণের ওপর অত্যাচার করে, তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব নেই, ছয় পাহাড়ের নিকট নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে, ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের কলোনী স্থাপনের জন্য তারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে প্রগতি বিরোধী যুদ্ধ করছে, তাদের নিজেদের মাঝে সংযোগ কম, নিজেদের মাঝে সংঘর্ষ হয়, তারা জনগণের সাথে যুক্ত নয়।

আমাদের দুর্বলতা ও শত্রুর সবলতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে আমাদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে হবে, এ যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী। আমাদের সবলতা এবং শত্রুর দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে আমরা শত্রুর আক্রমণকারী দুর্বল অংশকে পাল্টা ঘেরাও আক্রমণ করে দ্রুত ধ্বংস করতে পারি। এভাবে ধীরে ধীরে আমাদের দূর্বলতা কেটে যাবে, শত্রুর দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে। শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের হাতে ধ্বংস হবে।

৪

পাক সামরিক ফ্যাসিষ্টরা সংখ্যাল্পতার কারণে ঘেরাও-দমন বা “খোঁজ কর, ধ্বংস কর” অভিযানে নিজেদেরকে ছোট ছোট ইউনিটে (২ জন, ৪ জন, ৬ জন) ভাগ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে সমগ্রের তুলনায় কোন কোন ক্ষুদ্র দল দুর্বল হয়ে পড়ে।

জনসমর্থন নেই এবং জনগণ তাদের সাথে সহযোগীতা করেনা বলে তারা গেরিলাদের অবস্থান সম্পর্কে যথাযথ খবর পায়না, অজানা-অচেনা এলাকায় যুদ্ধ করছে বলে তারা পথ-ঘাট চেনেনা, ফলে তাদের অগ্রসরমান ইউনিটসমূহের মাঝে ফাঁক রয়ে যায়, ঘেরাও বলয়ের ফাঁক রয়ে যায়।

আমাদের গেরিলারা অগ্রসরমান পাক সামরিক দস্যুদের বিভিন্ন ইউনিটের ফাঁকের মাঝে অবস্থান করতে পারে, সবচাইতে দুর্বল ইউনিটকে অনুসন্ধান করে তাকে অনুসরণ করতে পারে, সুবিধামত স্থানে দস্যুদলটিকে

কয়েকজন গেরিলা সমাবেশ করে অতর্কিত হামলা করে ধ্বংস করতে পারে। আক্রান্ত ইউনিটের সহায়তায় অন্য কোন নিকটস্থ ইউনিট যাতে আসতে না পারে সেজন্য তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য গেরিলা নিয়োগ করা যায়। গেরিলারা দস্যুদলটিকে পরিপুর্ণভাবে ঘিরে ফেলবে, গুলির জাল তৈরী করবে, একটিও দস্যু যেন বেরিয়ে না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে; দ্রুত শত্রুদের খতম করে আহত, বন্দী, অস্ত্র, পোশাক নিয়ে সরে পড়তে হবে। সম্ভব হলে ও সুযোগ থাকলে অন্য দস্যু ইউনিটকে আক্রমণ করতে হবে।

চলমান শত্রুকে এভাবে আক্রমণের জন্য আমাদের শক্তিকে একত্রিত করতে হবে; আক্রমণ শুরু হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত গোপন থাকতে হবে, প্রয়োজন হলে ডাল-লতা-পাতা দিয়ে ছদ্মাবরণ তৈরী করতে হবে; ঝোপ-ঝাড়, বাঁশবন-কলার ঝাড়, জঙ্গল, শত্রুর পথে পড়বে এরূপ বাড়ীতে লুকিয়ে ওৎ পেতে থাকতে হবে।

অনুসন্ধানের ভুলের জন্য বড় শত্রুকে আক্রমণ করে ফেললে বা অন্য কারণে দ্রুত খতম করা সম্ভব না হলে শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য অল্পসংখ্যক গেরিলা রেখে গেরিলাদের প্রধান অংশকে সরে পড়তে হবে। বাকীরা শেষে সরে পড়বে। পাক-সামরিক দস্যুরা যখন কোন বিল্ডিং-এ ক্যাম্প করে বা বেশী সংখ্যায় অবস্থান করে তখন আমরা আক্রমণ করবো না। কেবলমাত্র চলমান শত্রুকে আমরা পূর্ব থেকে ওৎ পেতে অতর্কিতে আক্রমণ করবো।

শত্রু খতম নিশ্চিত হলেই আমরা আক্রমণ করবো। শত্রুদের খতম করা, তাদের অস্ত্র দখল করা যায়না এরূপ অবস্থায় আমরা একটিও বুলেট নষ্ট করবো না, অর্থাৎ ক্ষয়কারক যুদ্ধ করবো না। শত্রু সম্পূর্ণ খতম হলেই তাদের অস্ত্র-গোলাবারুদ আমরা দখল করতে পারি, তাদের শক্তি কমিয়ে দিতে পারি, তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে, জনগণ ও গেরিলাদের সাহস বাড়াতে পারি, শত্রুর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমরাও শক্তিশালী হতে পারি।

"শত্রু এগোয় আমরা পিছুই, শত্রু শিবির ফেলে আমরা হয়রান করি, শত্রু ক্লান্ত হয়, আমরা আক্রমণ করি, শত্রু পালায় আমরা পিছনে ধাওয়া করি।" "যখন আমরা জিততে পারি তখন লড়ি, জেতার আশা না থাকলে সরে পড়ি। তারা (শত্রু) যখন আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, আমরা তখন লড়বোনা, এমনকি, আমাদের খুঁজেও পায়না। কিন্তু আমরা যখন তাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই তারা যেন পালাতে না পারে এবং সঠিকভাবে আঘাত হানি ও নিশ্চিহ্ন করি। যখন আমরা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারি তখন করি, যখন পারিনা তখন আমাদের নিশ্চিহ্ন করার সুযোগ দেইনা।" প্রভৃতি নীতিসমূহ আমাদের প্রয়োগ করতে হবে।

আমাদের আক্রমণের সাথে যুক্ত করতে হবে জনসাধারণের প্রতিরোধ। সমস্ত রাস্তা উপড়ে ফেলে ক্ষেত বানিয়ে ফেলা, শত্রুর আগমণ পথে খাদ কেটে বাঁশের বা সুপারী গাছের বিষাক্ত শলা পুঁতে রেখে ঠিক রাস্তার মত বানিয়ে রাখা, শত্রুর চলার পথে পড়ে এরূপ খালের মধ্যে বিষাক্ত শলা পুঁতে রাখা, রাস্তার সমান করে ঢেঁকে রাখা, গ্রামের ঝোঁপ-ঝাড় থেকে বিষাক্ত তীর, ল্যাজা, বল্লম মারার ব্যবস্থা করা, রাস্তায় গ্রেনেডের ফাঁদ বানানো, মাইন পোতা, সম্ভব হলে ভীমরুল ট্রেইন করে তার ফাঁদ পেতে রাখা প্রভৃতি কাজ জনসাধারণের সাহায্যে করা যায়।

এভাবে গেরিলা ও জনগণের সমন্বিত যুদ্ধের ফলে পাকদস্যুদের ব্যাপকভাবে ক্ষতি করা সম্ভব। এ ধরণের সমন্বিত যুদ্ধ সম্ভব জাতীয় শত্রুমুক্ত আমাদের স্থায়ী বা অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকায়, যেখানে জনগণ আমাদের পক্ষে

এবং শত্রুর নিকট খবর যাবেনা। এ কারণে সামরিক দস্যুদের ভুলিয়ে মুক্ত অঞ্চলের গভীরে নিয়ে আসতে হবে, তাদেরকে জনগণ ও গেরিলাদের সমন্বিত যুদ্ধের সমুদ্রে ফেলতে হবে।

এভাবে যদিও আমাদের অস্ত্র, সৈন্য-সংখ্যা কম, ও তাদের মান নীচু, কিন্তু অধিকাংশ গেরিলাদের একত্রিত করার পদ্ধতি, জনগণের যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং বিপ্লবী রাজনীতিতে দীক্ষিত, আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ গেরিলাদের একত্রিত করলে তা পাক সামরিক দস্যুদের দুর্বল অংশের তুলনায় অনেকগুণ শক্তিশালী হয়। এভাবে সমগ্রের তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও অংশের তুলনায় আমরা উৎকৃষ্ট, এভাবে তাদের ঘেরাও-দমনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গ্রহণ করি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের নীতি, কিন্তু তাদের দুর্বল অংশকে পাল্টা ঘেরাও ও ধ্বংস করে আমরা প্রয়োগ করি আত্মরক্ষার মাঝে আক্রমণের রণকৌশল।
যখন পাক সামরিক দস্যুরা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আক্রমণ করে, গেরিলাদের অঞ্চল ছোট, জনসাধারণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনা, পাক সামরিক দস্যুদের বিভিন্ন ইউনিটসমূহের শক্তি ক্ষমতা আমাদের আক্রমণের ক্ষমতার চেয়ে বেশী, তখন আমাদেরকে গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে ঘেরাও বলয়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। আশে-পাশের শত্রু অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত করে দিতে হবে। অনেক সময় নিকটবর্তী আমাদের অন্য অঞ্চল থাকলে সেখানে সরে যাওয়া যায়। শত্রু অঞ্চলে ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিক, সহানুভূতিশীল, তাও সম্ভব না হলে ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল, সবুজ শস্যের যবনিকার মাঝে আশ্রয় নেয়া যায়।

ঘেরাও-দমন অভিযানে টিকতে না পারলে কোথায় স্থানান্তরিত করতে হবে সে বিষয়ে পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি থাকা উচিত। বাধ্য হয়ে স্থানান্তরিত হলে বিপর্যয়ের ও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। ১নং ফ্রন্ট এরিয়া থেকে পাক সামরিক দস্যুদের চাপের ফলে প্রত্যাহার এর উদাহারণ।

ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের বাড়িতে গেরিলাদের থাকতে হবে (শত্রু এলাকায়, মুক্ত এলাকায়ও) তাদের মধ্য থেকে গেরিলা সংগ্রহ করতে হবে, পার্টি গড়ে তুলতে হবে, তাদের ওপর সর্ব বিষয়ে নির্ভর করে জাতীয় শত্রু খতম অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। শত্রু-এলাকায় উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনার সাথে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হবে।

বিভিন্ন গেরিলা ইউনিটসমূহকে যোগাযোগের স্থান, উপায়, দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। ঘেরাও-দমনের বাইরের শত্রু-এলাকায় কাজ করার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি ইউনিটের স্বাধীনভাবে কার্য পরিচালনার ক্ষমতা।

ঘেরাও উঠে গেলে গেরিলা বাহিনী পুনরায় তাদের ঘাঁটি এলাকায় ফিরে আসবে।

এজন্য সমভূমিতে অস্থায়ী চরিত্রের ঘাঁটিতে বিরাট বিরাট ষ্টোর করা উচিত নয়, বহণ করে নিয়ে যাওয়া যায় এরূপ মালপত্র রাখা উচিত। দখলকৃত দ্রব্যাদির মাঝে যা বিক্রয় করা যায় তা বিক্রি করতে হবে, যা জনগণের মাঝে বিতরণ করা যায় তা বিতরণ করতে হবে।

এ সকল অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে পার্টির নেতৃত্বে এক বা একাধিক শক্তিশালী নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে। এর মাঝেই নিহিত রয়েছে ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের চাবিকাঠি। স্থানীয় অনিয়মিত গেরিলাদের মধ্য থেকে উন্নতমানের গেরিলাদের নিয়ে নিয়মিত গেরিলা গ্রুপ গঠন, নিয়মিত গেরিলা গ্রুপ

নিয়ে প্লাটুন, কয়েকটি প্লাটুন নিয়ে কোম্পানী—এভাবে সৈন্যসংস্থান গড়ে তুলতে হবে। এ সেনাবাহিনীর মাঝে পার্টি-সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, রাজনৈতিক কাজের ব্যবস্থা করতে হবে, যুদ্ধের মাধ্যমে একে পরিপক্ক করে তুলতে হবে, জনগণের মাঝে যুদ্ধ ছাড়াও প্রচার চালানো, তাদের মাঝে পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলা, তাদের সশস্ত্র করা, তাদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েমে সহায়তা করা, তাদেরকে গণসংগঠনে সংগঠিত করা প্রভৃতি কাজে দক্ষ করে তুলতে হবে। এভাবে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ, জনগণের সাথে যুক্ত, পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত একটি অজেয় বাহিনী গড়ে উঠবে।

অস্থায়ী বা স্থায়ী মুক্ত অঞ্চলে আমাদেরকে প্রকাশ্য কাজের সাথে গোপন কাজের সমন্বয় করতে হবে। ঘেরাও-দমন বা অন্যকোন কারণে আমাদের সেনাবাহিনী ও প্রকাশ্যে কার্যরত কর্মীরা অন্যত্র চলে গেলেও গোপন কার্যরত কর্মীরা, পার্টি-সংগঠন, গ্রামরক্ষী বাহিনী, স্থানীয় গেরিলা গ্রুপ, গ্রাম পরিচালনা কমিটি এবং অন্যান্য গণসংগঠন তৈরী ও পরিচালনা করতে পারবে, উচ্চতর স্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে। স্থায়ী বা অস্থায়ী মুক্ত এলাকায় এ কারণে পার্টি-সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। পার্টি-কাজ কিছুটা প্রকাশ্য হলে মূল অংশ গোপন থাকবে। শত্রু এলাকার পার্টি-কাজ সম্পূর্ণ গোপনে হবে। এর ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে ঘেরাও-দমনের ফলে নূতন জাতীয় শত্রুরা আমাদের ক্ষতি করতে না পারে বা আওয়ামী লীগ ফ্যাসিষ্ট মুক্তিবাহিনী আমাদের এলাকা দখল করলেও যেন আমাদের কাজ চলতে পারে।

আমাদের নেতৃত্বে জাতীয়-শত্রুমুক্ত এলাকা বিস্তৃত হলে এক অংশে ঘেরাও-দমন হলে আমরা অন্য অংশে সরে যেতে পারি। ১নং ফ্রন্ট এরিয়ায় আমাদের মুক্ত এলাকার এক অংশ পাক সামরিক দস্যুরা ঘেরাও করলেও কিছু অংশ ঘেরাও-দমনের বাইরে ছিল। একারণে সভাপতি মাও বলেছেন, গেরিলাদের সমভূমিতে টিকে থাকার প্রধান শর্ত হলো ঘাঁটি এলাকার বিস্তৃতি।

কোন একটি এলাকায় গেরিলা তৎপরতা শুরু করার সাথে সাথেই বিস্তৃতির সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। গেরিলা তৎপরতার সময় দূর-দূরান্ত থেকে জনগণ জাতীয় শত্রু খতমের তালিকা নিয়ে আসে এবং গেরিলাদের আমন্ত্রণ জানায়। গেরিলারা অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এ ধরণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে, প্রথমে অল্পদূরে এক-দুই দিনের জন্য যাবে, তারপর অধিক দিনের জন্য অধিক দূরে যাবে। এভাবে দূর-দূরাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ বিস্তৃত হবে; গেরিলা গ্রুপসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করতে শিখবে।

যে সকল অঞ্চল থেকে আমন্ত্রণ আসেনি কিন্তু আমাদের স্বার্থে গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত করা প্রয়োজন সেখানে প্রথমে প্রেরণ করতে হবে সন্ধানী অগ্রগামী দল বা কর্মী। এর কাজ হবে গোপনে ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিক ও সহানুভূতিশীলদের মাঝে কাজ করে জাতীয় শত্রুদের বিষয় অনুসন্ধান করা, গেরিলাদের থাকার ব্যবস্থা করা, স্থানীয় লোক সংগ্রহ করা। এই কাজের ভিত্তিতে আসবে গেরিলা দল। তারা জাতীয় শত্রু খতম করবে, সন্ধানী দল এগিয়ে যাবে। তার পেছনে যাবে গেরিলা দল, গেরিলা দলের পিছন আসবে সংগঠক দল। সংগঠক দল বা ব্যক্তির কাজ হবে জাতীয় শত্রু খতম হয়েছে বা হচ্ছে এরূপ এলাকায় ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের মাঝে পার্টি, গ্রামরক্ষী বাহিনী, স্থানীয় গেরিলা গ্রুপ, বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিকদের মাঝে পার্টিতে যোগদানে ইচ্ছুকদের মাঝে গড়ে তুলবে পাঠচক্র।

বিস্তৃতি উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনাহীনভাবে করা উচিত নয়। বিস্তৃতির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত বিভিন্ন গেরিলা অঞ্চল, ঘাঁটি এলাকা বা ফ্রন্ট এরিয়ার সাথে সংযোগ সাধন করা, মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের বড় সমাবেশ এড়িয়ে অগ্রসর হওয়া, গেরিলা যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক অঞ্চলের দিকে এগুনো ইত্যাদি।

আমাদের গেরিলা অঞ্চলগুলোর সাথে নদী-খাল যুক্ত। কাজেই নদী-খালে মাঝি, জেলে, চরের লোকদের মাঝে কাজ করে গেরিলা সংগ্রহ করতে হবে বা নৌকাসহ গেরিলাদের নদীতে নৌ-গেরিলা যুদ্ধের জন্য নিয়োগ করতে হবে। তারা নদীতে নৌকা ভাড়া খাটবে বা মাছ ধরে গেরিলা তৎপরতা চালাবে। নদী-খাল সংলগ্ন সমভূমির গেরিলারা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সহজেই এ সকল নৌকায় যেতে পারবে। নৌ-গেরিলারা চরাঞ্চল, নদী-খালের উভয় পার্শ্বে, নদী-খালে স্বাধীনভাবে এবং সমভূমির সাথে সমন্বিত করে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে পারবে। শত্রুর যাতায়াত ব্যবস্থাকে ব্যহত করতে সক্ষম হবে। এভাবে পূর্ববাংলার বিশেষতঃ সমভূমি আর নদী খাল, উভয় অংশে সমন্বিতভাবে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করা হলে এক নূতন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে।

শহরের গেরিলারা গ্রাম এবং নদীর গেরিলাদের অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা জাতীয় শত্রুদের খতম করবে। এভাবে গ্রামের বিপ্লবীযুদ্ধের সাথে শহরের কাজকে সমন্বিত করতে হবে।

৫

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিশেষ কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিক, যুবলীগ, পার্টির নেতৃত্বে গণসংগঠনের লোক ব্যতীত সরাসরি কাউকে গেরিলা দলে রিক্রুট না করা, গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী, প্রাক্তন আওয়ামী লীগ, মুক্তিবাহিনী ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের মাঝে ইচ্ছুকদের প্রথমে যথাযথ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে পাঠচক্রে সংগঠিত করতে হবে, সেখানে তারা কৃষকদের মাঝে কাজ করবে, পার্টির লাইনে শিক্ষা গ্রহণ করবে, গেরিলাদের সাথে অপারেশনে যাবে। এ প্রক্রিয়ায় যারা পার্টিতে যোগদানের যোগ্য তাদেরকে গেরিলা বাহিনীতে সংগ্রহ করা যায়। পাঠচক্র বা পার্টিতে যোগদানে ইচ্ছুক নয় এরূপ বুদ্ধিজীবি, জমিদার, ধনী চাষী, মাঝারী চাষী ও অন্যান্য শোষক শ্রেণী থেকে আগতদের গেরিলা হিসেবে সরাসরি সংগ্রহ করা বন্ধ করতে হবে, সংগৃহীত হয়ে থাকলে বের করে দিতে হবে। আলোচনার বিষয়ে আলোচনা সংক্রান্ত নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

যে সকল এলাকায় আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা রয়েছে সেখানে গেরিলা ও পার্টি-কর্মীরা কঠোরভাবে গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করবে, প্রধানতঃ শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষীদের ওপর নির্ভর করবে, তাদের বাড়ীতে ছড়িয়ে থাকবে, তাদের মাঝে পার্টি গেরিলা সংগঠন গড়ে তুলবে, তাদের ওপর নির্ভর করে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কাজ করবে।

কৃষকরাই হচ্ছে গ্রামের সবচাইতে বিপ্লবী শ্রেণী। জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ মুলতঃ এদেরই যুদ্ধ। আমরা কতখানি এদের ওপর নির্ভর, এদেরকে জাগ্রত ও সংগঠিত করি তার ওপর নির্ভর করছে আমাদের অস্তিত্ব ও বিপ্লবের বিজয়।

গ্রাম্য এলাকায় ক্ষেতমজুর, গরীব চাষীদের মাঝে জাতীয় শত্রুদের ভূমি বিনামুল্যে বিতরণ এবং দেশপ্রেমিক জমিদার-জোতদার-সুদখোরদের শোষণ কমানো দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করতে হবে। ভূমি বিতরণ ও সামন্তবাদী শোষণ কমানোর কর্মসূচী বাস্তবায়ীত করার মাধ্যমে কৃষক-জনতা একচেটেভাবে আমাদের সমর্থন করবে। আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলরা এ কর্মসূচীর বিরোধিতা করে কৃষকের শত্রু বলে পরিচিত হবে। ইহাই হবে তাদের সাথে আমাদের কাজের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।

এদের ওপর নির্ভর করে ছয় পাহাড়ের দালালদের গেরিলা তৎপরতা পরিচালনা করে ধ্বংস করা যায়। জনগণের ওপর নির্ভর করে আমাদের সতেরজন গেরিলা এই প্রতিক্রিয়াশীলদের দুইশত সাতাশিজনকে আক্রমণ করে, পাঁচজনকে হত্যা করে, বাকিরা প্রাণভয়ে পালায়। শেষ পর্যন্ত তারা পাক সামরিক দস্যুদের হাতে নিহত হয়।

আমাদের মুক্ত এলাকায় ঢুকে পড়া আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ওপরে উল্লেখিতভাবে গেরিলা তৎপরতা চালাতে পারি এবং তাদেরকে উৎখাত ও বিতাড়িত করে আমাদের এলাকায় আমাদের অধিকার কায়েম রাখতে পারি।

৬

সম্প্রতি আমাদের গেরিলাদের মাঝে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সমভূমিতে গেরিলা যুদ্ধ টিকিয়ে রাখা যাবে কিনা, আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের হামলার মোকাবেলা করা এবং তাদের উপস্থিতি রয়েছে এরূপ অঞ্চলে কাজ করা যাবে কিনা।

সমভূমিতে গেরিলা যুদ্ধ টিকিয়ে রাখা যাবে কিনা এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে ১নং ফ্রন্ট এরিয়ায় পাক-সামরিক দস্যুদের ঘেরাও-দমন অভিযানে তীব্রতা ও নির্মমতা এবং কর্মীদের বই পড়ে সৃষ্ট, পার্বত্য অঞ্চল গেরিলা যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক এ ধারণা থেকে। শেষোক্ত প্রশ্নটি উদ্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সর্বত্র উপস্থিতি, তাদের 'নকসাল' পেলেই খতম কর নীতি, এবং ১নং ও অন্যান্য ফ্রন্ট এরিয়ায় আমাদের ইউনিটসমূহকে ঘেরাও ও নিরস্ত্র করা, কর্মীদের বন্দী ও হত্যা করা, শেষ পর্যন্ত গেরিলাদের বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে প্রত্যাহারের কারণে।

পূর্ববাংলার অধিকাংশ অঞ্চলই সমভূমি এবং নদীমাতৃক। পূর্ববাংলার বিপ্লবের জয়-পরাজয় নির্ভর করছে এ সমভূমি ও নদীসমূহে গেরিলা যুদ্ধ সূচনা করা, টিকিয়ে রাখা, বিকশিত করার সমস্যার সমাধানের ওপর।

গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই প্রমান করেছে সমভূমিতে অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা বা পরিবর্তনশীল মুক্ত এলাকা স্থাপন করা যায়। ১নং, ২নং, ৫নং [২নং ও ৫নং ফ্রন্ট এরিয়াগুলো ছিল বৃহত্তর বরিশাল ও ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে—সর্বহারা পথ], পাবনা এবং টাঙ্গাইলের ফ্রন্ট এরিয়াসমুহ তার প্রমাণ।

এ সকল এলাকা জাতীয় শত্রুমুক্ত, গেরিলারা অবাধে বিচরণ করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম হচ্ছে বা হয়েছে।

১নং ফ্রন্ট এরিয়া ও অন্যান্য ফ্রন্টের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে পাক সামরিক দস্যুদের ঘেরাও-দমন আমাদের ধ্বংস করতে পারে না, ঘেরাও-দমন পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে না পারলেও, ঘেরাও-দমনের বলয় অতিক্রমন করে নূতন অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ সম্প্রসারিত করা ও টিকে থাকা যায়। এভাবে ১নং ফ্রন্ট এরিয়ার ঘেরাও-দমনের পর বরিশাল জেলার কয়েকটি অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ বিস্তৃতি লাভ করে, গেরিলারা টিকে থাকে।

কিন্তু গেরিলাদের মাঝে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলরা ছিল যারা ভারত-প্রত্যাগত মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে যোগ দেয় এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমাদের গেরিলাদের অবস্থান জানিয়ে দেয়। কোন কোন এলাকায় প্রতিক্রিয়াশীল জোতদার-জমিদার, বুদ্ধিজীবিরা আমাদের খবর আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের জানিয়ে দেয়। এর ফলে আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয়।

গেরিলা গ্রুপসমূহে পার্টি-সংগঠন না করা, গেরিলাদের রাজনৈতিক শিক্ষা না দেওয়া, নেতৃত্বে সমরবাদ, কমাণ্ডার-রাজনৈতিক কমিসারদের উষ্চস্তর ও সদস্যদের সাথে ভাল সম্পর্ক না থাকা, জনসাধারণের মাঝে কাজ না করা, কৃষকদের ওপর সর্ববিষয়ে নির্ভর না করা, গেরিলাদের অবস্থানের বিষয় এবং উষ্চস্তর-নিম্নস্তরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথাযথ গোপনীয়তা বজায় না রাখা প্রভৃতি এ বিপর্যয়ের কারন। কাজেই উপরোক্ত কারণসমূহ দূর করলেই আভ্যন্তরীন বিশ্বাসঘাতকতা ও দলত্যাগী বন্ধ হবে এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেউ আমাদের খতম করতে পারবে না।

উপরন্তু সরাসরি গেরিলা সংগ্রহ করতে হবে ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিক, যুবলীগ ও পার্টির নেতৃত্বাধীন গণসংগঠনের বিপ্লবীদের মধ্য থেকে। বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের মাঝে যারা পাঠচক্রে যোগদানের মাধ্যমে পার্টিতে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করে তারাই গেরিলা বাহিনীতে যেতে পারে।

গেরিলা ও পার্টি-কর্মীদের ক্যাম্প করে থাকার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে, ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের বাড়িতে ছড়িয়ে থাকতে হবে, তাদের সাথে শ্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে, তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে, এভাবে কর্মীদের পুনর্গঠন এবং কৃষকদের ওপর নির্ভরতা জন্মাবে এবং জনগণের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

এভাবে কৃষক-শ্রমিক-বিপ্লবীদের সমন্বয়ে জনগণের সাথে যুক্ত একটি অপরাজেয় বাহিনী গড়ে উঠবে।

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলরা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা নৌকায় থাকে বা জোতদার-মহাজনদের বাড়ীতে থাকে। তারা গেরিলা সংগ্রহ করে কমপক্ষে অষ্টমশ্রেণী পাশ বুদ্ধিজীবী থেকে। অর্থাৎ জোতদার, মহাজন, ধনী চাষী, বুর্জোয়াদের ছেলেদের থেকে।

গ্রাম্য এলাকায় ক্ষেতমজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের সমাজ জোতদার-জমিদার-ধনী চাষীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের পক্ষে সহজেই ক্ষেতজুর, গরীব চাষী, নিম্নমাঝারী চাষী, শ্রমিকদের মাঝে গোপন কাজ করা, গেরিলা সংগ্রহ করা, জাতীয় শত্রু খতম করা, পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলা, আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের খতম ও নিরস্ত্র করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনী রয়েছে—এরূপ অঞ্চলে কঠোরভাবে গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করতে হবে, একজন একজন করে গেরিলা সংগ্রহ করতে হবে; গোপনে থাকতে হবে, প্রয়োজনবোধে থাকার স্থান গোপন রাখার জন্য প্রতিনিয়ত স্থান পরিবর্তন করে থাকা যায়; থাকার স্থানে রাতে প্রবেশ করা, আবার শেষরাতে বেরিয়ে আসা, দিনে প্রয়োজন হলে মাচার ওপর থাকা প্রভৃতি পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়; গেরিলাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়া; ফিস্ ফিস্ করে প্রচার, পোষ্টার, লিফলেট মারফত প্রচার চালানোর পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

এক গ্রামের ক্ষেতমজুর-গরীব চাষীদের সাথে অন্য গ্রামের ক্ষেতমজুর-গরীব চাষীদের আত্মিয়তা-পরিচয় রয়েছে। এভাবে এক গ্রামের কৃষকের মাধ্যমে গ্রামের পর গ্রামে গেরিলা গ্রুপ গঠন, পর্টি-সংগঠণ গড়ে তোলা, জতীয় শত্রু খতম করা, গেরিলা তৎপরতাকে বিস্তৃত করা যায়।

এ সকল কাজে ঐ ধরণের বুদ্ধিজীবি লাগাতে হবে যারা সহজেই ক্ষেতমজুর, গরীব চাষীদের মত জীবন ধারণ করতে পারে ও কঠোর গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করতে পারে।

যে সকল অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী স্থায়ীভাবে থাকে না কিন্তু আনাগোনা করে সেখানেও ওপরের পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। ঢাকার নিকটে তিনটি অঞ্চলে এভাবে কাজ হচ্ছে। আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের নাকের ডগায় আমাদের কাজ হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আমাদের সহানুভূতিশীল বা কর্মীদের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। এদের নিরস্ত্র ও উৎখাত করার কাজ অচিরেই শুরু হচ্ছে।

অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে রিক্রুটমেন্ট এবং কাজের বেলায় উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করলে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের এলাকায়, তারা আনাগোনা করে এরূপ এলাকায় আমাদের গেরিলা যুদ্ধকে বিস্তৃত করা ও টিকিয়ে রাখা এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলদেরকে বিতাড়িত করে তাদের এলাকা দখল করা যায়।

আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলরা সাধারণতঃ নৌকায় অবস্থান করে, চলমান অবস্থায় থাকে। তারা সাধারণতঃ সামন্ত-জমিদার, ধনী চাষীদের বাড়ীতে ওঠে; বেপরোয়া পান-ভোজ চালায়, অর্থের বিনিময়ে জাতীয় শত্রু ছেড়ে দেয়, তাদের বাড়ীতে থাকে, জোর করে অর্থ সংগ্রহ করে, কখনও কখনও গরীব লোকদের বাড়ীতে উঠে মাংস-ভাত খেতে না পেলে মারধোর করে, বন্দুকের ডগায় গরীব মাঝিদের বিনাপয়সায় কাজে লাগায়, জনগণকে অস্ত্র বহণে বাধ্য করে, মেয়েদের ওপর নির্যাতন করে, ডাকাতি করে, জনগণের ধন-সম্পত্তি নষ্ট করে, বিশেষ করে পাট পুড়িয়ে দেয়, ফসল নষ্ট করে।

প্রায় ক্ষেত্রেই মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা হচ্ছে জমিদার-জোতদার-ধনী চাষী, বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর সন্তান। তারা স্থানীয় ক্ষেত মজুর, গরীব চাষী, নিম্ন মাঝারী চাষী, শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখার জন্য বন্দুক ব্যবহার করে।

তারা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে যাকে খুশি তাকেই হত্যা করে, এমনকি নিজেদের লোকদেরও হত্যা করে।

তারা জনসাধারণের মাঝে প্রচার, তাদেরকে সশস্ত্র করা, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি কাজ করেনা।

তারা দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে নিরস্ত্র ও খতম করার পথ গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে তারা তথাকথিত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্দেশে ছয় পাহাড়ের স্বার্থে কাজ করছে।

এ সকল কারণে জনসাধারণ অধিকাংশ এলাকায় তাদের ওপর ক্ষুব্ধ এবং তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। কোন কোন এলাকায় জনগণ মুক্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীলদের খতম করলে পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক। তারা পাক সামরিক দস্যু ও মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল দস্যুদের উভয়কেই উৎখাত করতে চায়।

এ প্রতিক্রিয়াশীল দস্যু বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের মাঝে প্রায় ক্ষেত্রেই কোন সংযোগ নেই। তারা নিজেদের মাঝে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে নিরস্ত্র করে বা হত্যা করে।

পাক সামরিক দস্যুদের ঘেরাও-দমন বা "খোঁজ কর, ধ্বংস কর" অভিযান মোকাবিলা করার জন্য যে সামরিক নীতি ও কৌশল, মনোবল, জনগণের ওপর নির্ভরতা প্রয়োজন তা তাদের নেই; যদিও তাদের আধুনিক অস্ত্র ও লোকবল রয়েছে।

যে সকল জাতীয় শত্রুদের বাড়ীতে তারা থাকে বা যাদেরকে তারা ছেড়ে দেয় তারাই সামরিক দস্যুদের ডেকে এনে তাদেরকে খতম করবে। কোন কোন এলাকায় জনসাধারণও তাদের বিরুদ্ধে সামরিক দস্যুদের সাথে সহযোগীতা করবে।

পাক সামরিক দসূদের শীতকালীন অভিযানের মুখে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল দস্যু বাহিনীর বড় বড় ইউনিটসমূহের টেকা সম্ভব হবেনা। তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে, অনেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে, ভারতে চলে যাবে। ইতিমধ্যেই পরবর্তী বর্ষায় আসবে বলে অনেকেই ভারতে চলে যাচ্ছে। ঢাকা শহরে এভাবে গ্রেপ্তারের ফলে বিভিন্ন ইউনিট-সদস্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

এর ফলে মুক্তিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল দস্যু বাহিনীর সৃষ্ট আমাদের উপরস্ত চাপ কমে যাবে।

এরূপ অবস্থায় এ দস্যুবাহিনীর সদস্যদের নিকট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা, তাদের পরিত্যাক্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। আমাদের পুরোনো এলাকায় পুনরায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে।

৭

উপরোক্ত বিষয়সমূহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করা এবং সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করা হলে আমরা অবশ্যই সক্ষম হবো আমাদের বিকাশ ও গতিকে বজায় রাখতে, আরো জটিলতর সমস্যার মোকাবিলা করে বিজয় অর্জন করতে। ■